জীবনক্ষুধা

হাসনান আহমেদ

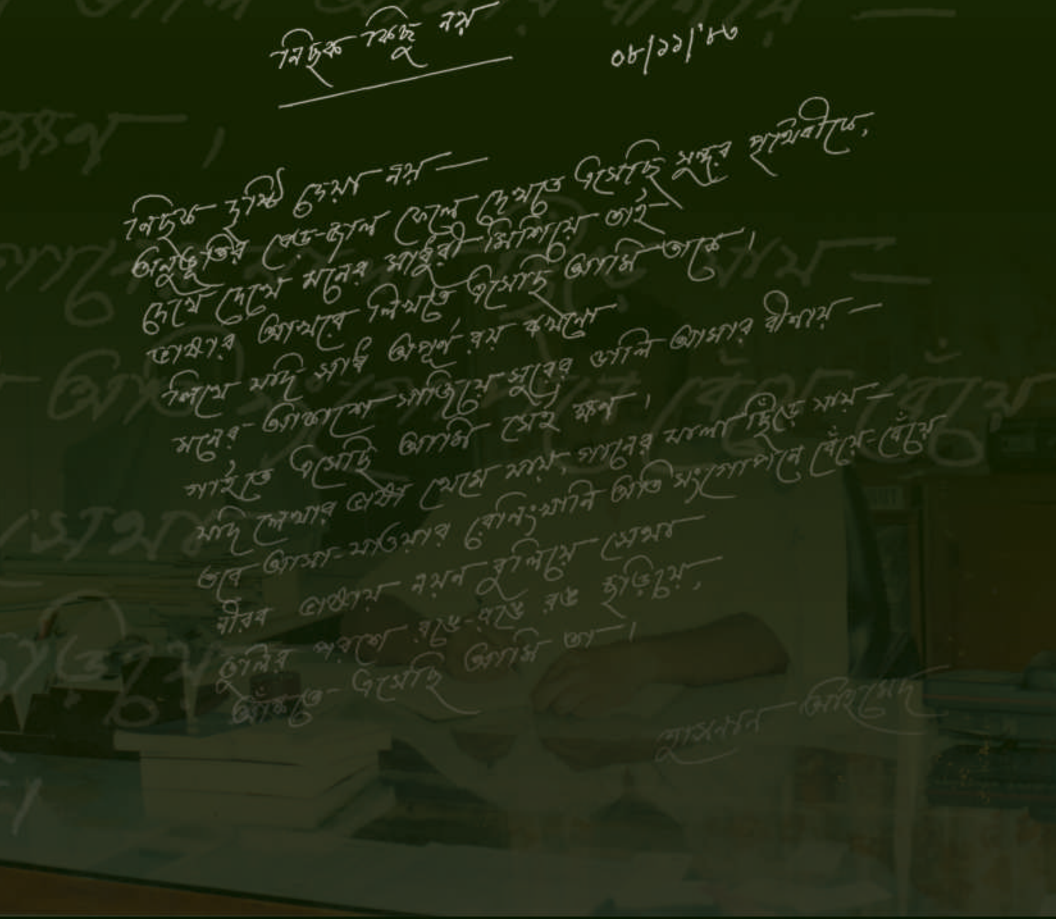

জীবনক্ষুধা

হাসনান আহমেদ

প্রকৃতি

জীবনক্ষুধা

হাসনান আহমেদ

স্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০১৬

প্রকাশক

প্রকৃতি

১ কনকর্ড এম্পোরিয়াম (বেজমেন্ট)

২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: prokirti.book@gmail.com

মুদ্রণ

অর্ক

৩/১, ব্লক এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০২২০-২

মূল্য: ২০০.০০ টাকা

Jibonkhudha by Hasnan Ahmed

Published by Prokriti, Dhaka, February 2016

Price: Tk. 200.00

উৎসর্গ

‘কণিকা’
ছবি মানস-পটে আঁকা
সুতা-কাটা ঘুড়ি স্মৃতির গগনে
তোমার স্মরণে

আমার কথা

‘জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা’– কথাটা কোথায় যে পড়েছিলাম, আজ তা আর মনে নেই। তবে, এর যে একটা গূঢ় তাৎপর্য আছে সেটা বাস্তবে দেখলাম– পরিণতিস্বরূপ আজ ‘আমার কথা’ শিরোনামে লিখছি। জীবনের এ পড়ন্ত বিকেলে এসে যে-এক দোমনা অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম তার পরিসমাপ্তি ঘটলো।

ছোটবেলা থেকেই কবিতা আমার ভালো লাগতো, কিন্তু সে ভালোলাগা তখন কবিতা লেখা পর্যায়ে গড়ায় নি। বরং আমি একজন বড় মাপের চিত্রশিল্পী হবো এমন বাসনা মনে মনে পোষণ করতাম। বইয়ের যত ছবি খাতায় আঁকতাম, এঁকে আনন্দ পেতাম। বাড়ি থেকে বেশ দূরে– শহরে যেতাম, বিভিন্ন সাইনবোর্ডের লেখার স্টাইল লক্ষ্য করতাম। বাড়িতে ফিরে সেগুলো আবার খাতায় অবিকল লিখতাম এবং ছবিগুলো আঁকতাম। খুব ইচ্ছে ছিল ভবিষ্যতে আর্ট কলেজে ভর্তি হবার। এভাবেই দিন কাটছিল। ধীরে ধীরে কীভাবে কখন গানের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলাম মনে নেই। ক্লাসের পড়া মনে থাকতো না বটে, তবে গান মনে থাকতো। হাই স্কুলের শেষ পর্যায়ে এসে গান গেয়ে কয়েকবার প্রাইজও পেয়েছি– ভালোই লাগতো। বিখ্যাত গায়ক হবার স্বপ্ন বেশ অনেক দিন ধরে দেখেছিলাম। দুটো কাজেই পরিবার থেকে বাধা এলো। তাঁরা চেয়েছিল আমি অনেক লেখাপড়া করে উচ্চ ডিগ্রীধারী হবো।

এস.এস.সি. পরীক্ষা শেষে রেজাল্টের জন্য তিন মাস অপেক্ষার পালা। পাস করার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। বাড়িতে ফিরে লেখালেখি শুরু করে দিলাম। আসলে সেগুলো কবিতা হতো কিনা জানি নে, তবে লিখতাম। তিন মাসে বেশ অনেকগুলো লেখা জমা হয়ে গেল। প্রথম লেখাটি ছিল ‘অনুশোচনা’ নামে একটি কবিতা, সন-তারিখ মনে নেই। সেটা মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল– তাই রক্ষে। রেজাল্টের পর কলেজে ভর্তি হলাম। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল কাদের স্যারের সান্নিধ্য পেলাম। তিনি আমার মতো আরো বেশ কিছু ছাত্র নিয়ে কবিতা পাঠের আসর বসাতেন। তিনি আমাকে উৎসাহ দিতেন, গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা করতেন, অনেক সহযোগিতা করতেন। এইচ.এস.সি. পাসের পর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও সাহিত্য-ভাবনা শিঁকেয় উঠলো।

ভর্তি হলাম হিসাববিজ্ঞান বিভাগে। নিজ জীবনের হিসাবে গরমিল রেখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাব শেখার ও ব্যালান্সশীট মেলানোর কাজে মনোনিবেশ করলাম। 'ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরির খেলা'-র মতো সাহিত্য ও ডেবিট-ক্রেডিটের লুকোচুরির খেলা শুরু হয়ে গেল। পরিণামে ডেবিট-ক্রেডিট জিতে গেছে। পেশাদার হিসাববিজ্ঞানী হয়েছি। জীবনের ব্যালান্সশীট অনেক চেষ্টার পরও কোনোদিন মিলাতে পারি নি। এভাবে চাওয়া-পাওয়া এবং নেশা ও পেশার মাঝে আজীবন যার-পর-নাই দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আসলে জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে, যা কোনোদিন আমার আত্মবিকাশের অনুকূলে আসে নি। শুধু দাঁড় বেয়ে, কখনোও বা গুণ টেনে জীবন ডিঙি প্রতিকূলে বেয়ে চলেছি।

সম্ভবতঃ বিরাশি সালের শেষের দিকে অথবা তিরাশি সালের প্রথম দিকে বি.কম. (অনার্স) ও এম.কম. পরীক্ষার চার বছরের কোর্স মোটামুটি সাত বছরে শেষ করে বেকার তৈরির কারখানা থেকে গড়া মেরে বাইরে চলে এলাম। ঐ সময় কিছু লেখালেখির চেষ্টা করেছিলাম। এগুলো সেই সময়কার ফসল। এ সুদীর্ঘ বছরে অনেকবার লেখালেখিতে ফিরে আসবো বলে ভেবেছি, চেষ্টা করেছি, কিন্তু 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়' হওয়াতে প্রকারান্তরে হার মেনেছি। তিন বছর আগে অতীতের লেখাগুলো– সব মিলিয়ে দশ-বারোটা পাণ্ডুলিপি, খুঁজে ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছিলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও না পেয়ে হতোদ্যম হয়েছিলাম। বুঝেছিলাম, সুদীর্ঘ বত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর আগের স্বকীয়-ভাবের অভিব্যক্তি পেশা ও নেশার টানাপড়েনে অযত্ন ও অবহেলায় অভিমান করে যার যার পথ খুঁজে নিয়েছে। এক মাস আগে পুরোনো বই-খাতাপত্র ঘাটতে গিয়ে দু'টো পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেলাম– এটি তার একটি, অন্যটি উপন্যাস। কোনো কোনো লেখার তারিখ আছে, কোনোটার বা নেই। সেভাবেই ছাপিয়ে দিতে বলেছি। তবে লেখাগুলো যে বিরাশি-তিরাশি সালের মধ্যে লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটি দেখলাম সাতাশি সালে লেখা, অন্যটি প্রথম লেখা যা আগেই উল্লেখ করেছি।

লেখাগুলোর মধ্যে ভোগবাদী জীবনাদর্শে বিশ্বাসীদের জন্য তেমন কিছু নেই। লেখাগুলো ভাবোদ্দীপক ও ভাবগ্রাহী– ভাবুক মনের খোরাক জোগাবে বলে আশা রাখি। আমি ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যমনা, কিংবা বলা যায় সাহিত্যামুদে– তবে কখনো সাহিত্যরথী নই। সেক্ষেত্রে লেখাগুলোকে কবিতা বলা যাবে কিনা এ বিষয়ে আমি দ্বিধান্বিত। এগুলোকে আমি কখনো

মান-বিচারে কবিতা বলে দাবি করি নে। শুধু কালির আখরে অসীম জীবনের চেতনাকে আবেগভরে আঁকতে চেষ্টা করেছিলাম মাত্র। দেখা যাবে, মনে ভাব আছে– প্রকাশের ভাষা নেই, কখনো বা ভাষা আছে– ভাষার জ্ঞান নেই, রীতি-নীতি জানা নেই। তবুও জীবনের এই পাদপ্রান্তে এসে অতীত কর্মকে ঠেলে পিছে ফেলে দিতে পারলাম না বলেই প্রকাশনের এই প্রলম্বিত প্রয়াস। সেজন্য সাহিত্যরসিক সমাজের হাতে ছাপার আখরে লেখাগুলোকে তুলে দিতে পেরে আমি বিবেকের কাছে দায়মুক্ত এবং আনন্দিত।

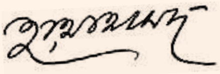

ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৬ (হাসনান আহমেদ)

সূচিপত্র

জীবনক্ষুধা ১১
সান্ত্বনা ১২
চাওয়া পাওয়া-১ ১৪
চাওয়া পাওয়া-২ ১৪
বিক্ষিপ্ত ভাবনা ১৫
আমার সমাধি তীরে ১৭
আকাঙ্ক্ষা ১৯
আসবো না আর ফিরে ২০
আর্ত চিৎকার ২১
মৃত্যু ২২
পদ্মা ২৩
জীবন-মঞ্চ ২৫
করণীয় কিছু ২৮
বন্ধু আমার সোনার হরিণ ভাই ২৯
আমার কেবলই বাঁশি ৩০
মনে ছবি একজনই আঁকে ৩১
হারালি কি তুই জীবন প্রাতে ৩২
নিছক কিছু নয় ৩৩
তোমায় দেখেছি বহু বেশে ৩৪
একই চাওয়া ভিন্ন সময়ে ৩৫
নারী-১ ৩৬
নারী-২ ৩৭
সমর্পণ ৩৮
অনেক কথা ছিল বলার ৩৯
একাকী ৪০
করবে না ক্ষমা জানি ৪১
স্মৃতিকথা ৪২
বিদায়ের পালা ৪৩
অনুশোচনা ৪৪
তোমাকে মনে পড়ে ৪৫
আত্মবিশ্বাস ৪৬
নেভা দীপ ৪৭
সেই ভালো হতো ৪৮
অস্তিত্বের সংকট ৪৯
বেকারত্ব ৫০
ওগো সাথি পথ বহুদূর ৫১

জীবনক্ষুধা

জীবন মহাসমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে ভেসে
ক্ষুদ্র একটি চরে বেঁধেছি ঠাঁই এসে,
কতদিন জোয়ার রবে তা নাই আমার জানা–
ভাটার টানে আবার মেলে দেব ডানা,
ফিরে যাব আপন নীড়ে।
এমনই অজানার ভীড়ে–
এসেছিল মোগল, এসেছিল পাঠান, গ্রিক,
এমনই কত যে এসেছিল আরো গণনা হয় নি ঠিক।
গজনীর মাহ্‌মুদ, মুসা, তারিক, শেরশাহর মতো বীর,
তলোয়ার হাতে করেছে শাসন, করে নি তো নত শির।
তাঁরাও গিয়েছে চলে একই স্রোতের টানে,
বিধাতার অমোঘ বিধান, প্রকৃতির প্রয়োজনে।
আমাকেও চলে যেতে হবে জোয়ারের শেষে,
শুধু একটি বাসনা রবে মোর আজকে এ প্রবাসে,
জীবনের নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে
পেয়েছি যেটুকু আলো তা থেকে,
পারি যেন আঁকতে যুগের অক্ষয় পটে
সাক্ষ্য আমার, আমি যে এসেছিলাম এ ধরাতটে
খেলতে ধুলোখেলা দুদিনের তরে।
মুছে যেন না যায় পদচিহ্ন মোর মরণের পরে,
আমার এ জীবনের গান, একান্ত চাওয়া,
আমার এ কবিতাখানি, পাওয়া না-পাওয়া,
পারি যেন পৌঁছে দিতে অনাগতের দ্বারে,
তারপর, সেই-সে ভাটার টানে চলে যাব চিরতরে।

১৫.১০.১৯৮২

সান্ত্বনা

এসেছি একদিন যেতে হবে চলে
অতি সংগোপনে, এ খেলাঘর ফেলে।
যেমনিতে পোহাতে নিশি উড়ে এসে পাখি
বসে পর্বতচূড়ে, এ মায়া কানন দেখি
কতই না ললিত গীতে মুখরিত করে তোলে
এ সবুজ প্রান্তর, যত মধু দেয় ঢেলে
করতে আরও সুমিষ্ট তার রব,
তারপর, দিনের শেষে ফেলে সব
উড়ে চলে যায় অজানার পথে,
যাত্রী সে হয়ে তার কালের রথে।
কত গোলাপ নিজেরে হারিয়ে
দিয়েছে ঘ্রাণ বিকশিত হয়ে,
কে তারে রেখেছে মনে অনন্তকাল ধরে!
কিবা পেল প্রতিদানে বিলায়ে নিজেরে
চিরদিনের মতো। কিবা তার সান্ত্বনা
ক্ষণিকের আসায়, শুধু বিড়ম্বনা–
না আসাই যেন ছিল ভালো,
তবুও যতটুকু পেয়েছে আলো
যা কিছু দিয়েছে আনন্দ যারে,
সেটুকুই সার্থকতা তার ক্ষণিক জীবনের তরে।
আমিও এমনি করে এসেছি অনেক পথ বেয়ে,
তাও তো ফুরিয়ে এল! আমার বিদায়ে
কি রবে সার্থকতা, কিই-বা আমার সান্ত্বনা,
কেনবা এলাম কেনবা এত বঞ্চনা!
যতটুকু এসেছি কতটুকু তার করেছি জয়,
এ বিশ্বের হাটে কতখানি তার দিয়েছে আমায়,
কতটা তার করেছি পূরণ এতদিনে,
কিবা অংশ ফাঁকা পড়ে র'তো আমার বিহনে!

চলতে পথে যাদেরে দেখেছি
যাদেরে নিয়েছি আপন করে, শুনিয়েছি
একান্ত কথা নিজের ভাষায়–
দু'একটি ছন্দ, দু'একটি গান প্রাণের ব্যথায়।
কতটুকু স্থান পেরেছি করে নিতে তাদের হৃদয়ে,
কতখানি অবদান পেরেছি রাখতে এ-ক্ষণিক সময়ে।
কত ব্যথা পেল তারা আমার বিদায়ে–
ক্ষণিকের তরে, নাকি জনম দুঃখী হয়ে?
কতদিন রাখবে মনে যখনকার তখন,
না অনাদিকাল ধরে সে ব্যথা না হবে পূরণ?
সেই তো সার্থকতা আমার, সেই তো পরম পাওয়া,
শুধু এটুকুই সান্ত্বনা নিয়ে এবারের চলে যাওয়া।

৩১.১২.১৯৮২

চাওয়া পাওয়া

১

হে মোর বিধাতা, জগৎবিধাতা
তোমার কাছে এই কি ছিল মোর চাওয়া?
এ জনমের লাগি যা চেয়েছি
তার কিছুই কি হলো পাওয়া?
যদি বলি পেয়েছি যা
তার আদৌ কিছু চাই নি,
চেয়েছি যা নিজের ক'রে
পাই নি, কিছুই তার পাই নি।

০৮.০৮.১৯৮২

২

এ ভবে লভিয়া জন্ম
ভেবেছি শুধু তাই,
দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিলে
কূলের ঠিকানা নাই।
দুঃখকে বড় ভালোবাসি বলে
দুঃখকে করতে জয়,
ঘুরে মরি শুধু এ-ভব পাকে
সুখের আশাতে নয়।

২২.০৮.১৯৮২

বিক্ষিপ্ত ভাবনা

কত কি যে ভাবি বসে
বলবো তা কোন সাহসে,
কি জানি শুনে সবে হেসে লুটোপুটি খাবে,
দেশসুদ্ধ কলঙ্ক হবে।
একবার ভাবি,– হব আমি এ দেশের রাজা,
দেখিয়ে দেব ভালোবাসে কেমনে প্রজা।
আবার ভাবি, না–
দেশের অবস্থা যা,
একেবারে খেয়ে যাব ডিগবাজি,
এ কাজে আমি নই রাজি।
আবার ভাবি,– হব একটা বড় বৈজ্ঞানিক
ছুটোছুটি বাঁধিয়ে দেব এদিক-সেদিক,
যা কিছু বাকি আছে সব করে আবিষ্কার
বইয়ের পাতায় হয়ে রব অমর।
তারপর,– ভেসে আসে কানে
বাজে দিবা নিশি প্রাণে,
অন্নহীনের অন্ন চিৎকার–
নাই কি এর কোনো প্রতিকার?
ভাবি,– বড় বিশ্বনেতা হব
নীতি সব জোগাড় করবো অভিনব,
খুঁজে নিঃস্ব-গরিব জন
দুঃখ তাদের করবো মোচন।
আস্তে আস্তে উবে যায় আশা,
মনের মাঝে বাঁধে ঘোর বাসা,
কি জানি পুঁজিবাদের এক গুপ্তচর
বলবে,– বেটারে ধর,
করে দেবে প্রাণ সমাপন

এত সহজে মরতে চায় না মন।
তারপর, মনের যত বিদ্রোহের সুর
অনেক কষ্টে করে সবি দূর,
ভাবি,– একজন গায়ক হব,
দুঃখ যত আছে বিশ্বজনে ক'ব
সুরের লহরী তুলে।
অল্পক্ষণে সে সমস্ত ভুলে
হয়ে উঠি একান্ত আপনভোলা–
এ ধরায় সুন্দরের আছে যত খেলা
খেলবো আমি, তুলি নিয়ে বসি'
আঁকবো একান্ত হয়ে দিবা-নিশি
কত শত, বসুধার মতন
নিরবে আঁকবো সবি করে যতন।
কিন্তু– না, আমার চোখে রঙের বড় অভাব,
ভাবি তাই বসে কেমনে ধরি শিল্পীর স্বভাব
তাই তো পারি না আঁকতে,
মনের মাঝে কত শত আবেগ থাকতে।
শেষে নিয়ে বসি কলম-খাতা
লিখে চলি মনে আসে যা-তা,
আমার নিজের গ্লানি, বিফলতা
শেষে নাম দিই কবিতা।

২৮.০৮.১৯৮২

আমার সমাধি তীরে

যদি মনে পড়ে যদি দেখতে চায় এ মন,
ফিরে এসো যেথা মোর ‘সমাধি-মরণ’।
যেথা গান গায় পাখি, কোকিলের কুহু সুর,
রেখে যায় মায়া, বকুলের গন্ধে ভরপুর।
যদি মনে পড়ে, নীরবে দাঁড়িও আসি’
মোর সমাধি তীরে। ব’লো, “ভালোবাসি
তাই এসেছি ফিরে দেখতে তোমায়,
যেথা শায়িত তুমি বকুলের ছায়।”
ফিরায়ে দেবো না তোমায়, করবো না বারণ,
যদি আসো যেথা মোর ‘সমাধি-মরণ’।
যদি কথা বলতে সাধ জাগে নিভৃতে একাকী,
ব’লো কথা কানে কানে সারা রাত জাগি’,
শুনবো আমি কান পেতে এ মাটির বুকে
তোমার আমার প্রাণে জ্বলবে ধিকে-ধিকে,
জুড়াবো দগ্ধ এ হৃদয়ের জ্বালা,
তোমাদের লাগি হয়েছে যা পুড়ে পুড়ে কালা।
যদি শরতের জোছনার রাতে
ঘুম যদি না আসে আঁখিপাতে,
যদি মনে পড়ে অতীত দিনের স্মৃতি–
যে বাঁধনের হয়েছে ইতি,
যদি মুখখানি মোর ভেসে ওঠে স্মৃতিপটে
দেখা হয়েছিল যার সাথে এ ভব-সাগর তটে
তখন, যদি দেখতে চায় এ মন
ফিরে এসো যেথা মোর ‘সমাধি-মরণ’।
যে জন ছিল তোমাদের মাঝে,
সে আর আসবে না যে
পথের কাঁটা হতে। যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস

করে নি কখনো, শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস
নিয়ে বুকে, দুঃখরে করেছিল বরণ
সারাটা জীবন ভরে। তারে, যদি দেখতে চায় এ মন
যদি মনে পড়ে– এসো ফিরে
সেথা, মোর সমাধি তীরে।
যেথা জুড়াতে সকল ক্লান্তি,
দানিয়াছি এ দেহ-প্রাণ, লভেছি শান্তি–
সঁপে দিয়েছি মোরে,
মাটির কারাগারে।

৩০.০৮.১৯৮২

আকাঙ্ক্ষা

নিয়ে চলো মোরে সেই অসীমের দেশে
দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন অনাবিল পরিবেশে,
যেথা পাখি মেলেছে ডানা, ঐ সুদূরে–
সবুজ মিশেছে যেথা দূর নীলাম্বরে
গড়েছে এক নূতন জগৎ। নেই ভয়,
নেই দুঃখ, নেই হানাহানি, নেইকো নির্দয়,
হিংসা, পাপ করে নি যেখানে কালো–
শুধু জ্ঞান, জীবপ্রেম এনেছে যেথা আলো
করতে শান্তির আলয়। যেথা প্রাণে প্রাণে
ভালোবাসাবাসি, শুধু হাসাহাসি হৃদয়ের টানে,
বলতে না হয় যেথা হৃদয়ের পুঞ্জিত ব্যথা
দেখে মুখ বুঝে নেয় একান্ত মনের কথা।
যেথা জনে জনে এমনিতে বেঁধেছে প্রীতির ডোরে
করেছে নিজেকে ত্যাগী একে অন্যের তরে।
প্রতিজন মহাত্মা যেন সেই সে আবেশে
যেতে বড় ইচ্ছা মোর সেই অসীমের দেশে।
যে দেশে মানুষ মানুষের করে না শাসন
আপনিতে আপন ব্রত তুলে ধরে মন,
সত্যকে করতে জয় ত্যাজিয়া সকল হীনতা
বয়ে আনে শুভ ধ্যান পুণ্য পুষ্পসম বারতা,
মিশেছে পুণ্যাত্মা যবে শান্তির আশে
নিয়ে চলো মোরে সেই তীর্থ দেশে।
মানুষে মানুষে নেই যেথা কোন ভেদাভেদ
উঁচু-নিচু বলে কারো নেই মনে খেদ,
সকলি সত্যের পূজারী শ্রেষ্ঠ সত্য মন
মিথ্যার ভ্রূকুটিতে নেই ভয়ের কারণ,
প্রতারিত, প্রতারক বলে নেই ভুল বোঝাবুঝি
একই হৃদয়ের নিরঙ্কুশ ভাষায় গিয়েছে মজি'
সেই অজানার তলে। আমিও প্রাণ-মন খুলে
আবার করতে চাই খেলা এ জনলোক ভুলে।
বড় সাধ মোর বড় সাধ আজ জাগে,
নিয়ে চল মোরে খেলতে সে খেলা এ সংসার বিরাগে।

০৬.১০.১৯৮২

আসবো না আর ফিরে

এ ভব পারাবারে–
আমি পথিক, দেখা হবে পথে, আসবো না আর ফিরে।
চলার পথে তুলে নেব ঝরা ফুল যত,
গাঁথবো মালা প্রতিদিন অবিরত,
পথে পাওয়া ফুল পথের মাঝে রাখি
আবার চলবো পথে, ফিরিয়ে নেব আঁখি,
শুধু ঘ্রাণটুকু রয়ে যাবে হৃদয় ভরে
বাঁধবো না কারো মায়াজালে চিরতরে।
চলা, আর চলা– অনন্তের পানে
ক্ষণিকের তরে পথের দেখা– পথের টানে
চলে যাব আবার নূতনের খোঁজে,
পড়ে র'লো যা, র'লো পড়ে সে যে
চিরদিন চিরতরে–
কুড়িয়ে নিতে তারে পুনর্বার আসবো না আর ফিরে।
পথের দু'ধারে কচিকাঁচাগুলি
তুলে নেব বুকে হিংসা ক্রোধ ভুলি,
দিয়ে যাব বুকভরা ভালোবাসা–
না রবে কোথা মোর একটুখানি বাসা,
পথের আনন্দে পথে যাব চলে ধীরে ধীরে–
পথের পথিক দেখা হবে পথে, আসবো না আর ফিরে।

২০.১০.১৯৮২

আর্ত চিৎকার

আমি ক্ষুধার্ত মানুষের দলে
যারা বুভুক্ষু, বস্ত্রহীন,
বাস্তুহারার দল,
যারা অনাহারে কাটাই দিন।
ক্ষুধার তাড়নায় কেঁদে মরে,
শেষে আহূত চিৎকার তুলে বলে–
অন্ন চাই, বস্ত্র চাই,
নিজের মানমর্যাদা ভুলে।
তবুও শোনে না কেউ কথা
শুধু বলে– ফিরে যাও, যাও ফিরে,
চিৎকারগুলো প্রতিধ্বনি হয়ে বাজে দেয়ালে
পৌঁছায় না অট্টালিকার ভিতরে।

২৭.০৮.১৯৮২

মৃত্যু

ওরে ভয় নাই, ভয় নাই, মৃত্যুরে নাই ভয়,
সে যে নূতনের জয়কেতন পুরাতনের পরাজয়।
এসেছে নূতন, পূর্ণ উদ্যম, তেজস্বী বীর্যবান,
ত্বরা সরে পড়, রাখিস নে ধরে, দে ছেড়ে স্থান।
চেয়ে দেখ ঐ মৃত্যু কালিমার আড়ালে নবীন প্রাণ,
বিনিময়ে কিছু অগতির গতি পেয়ে গেল পরিত্রাণ।
মৃত্যু আশীর্বাদ সম– কে বলে নির্দয় সে তো,
পথ দিল খুঁজে পড়ে ছিল পথে জরা, ক্লিষ্ট যত।
চলার পথের শক্তির খেলায় হলো যারা স্থির, অচল,
মৃত্যু না দিলে স্থান করে কোথা যেত অভাগার দল!
কালে কালে সমাজের আবর্জনা যত লুকালো তার গ্রাসে,
অহেতুক কতক কাপুরুষের দল কাঁদলো আপন ত্রাসে।
ফুরিয়েছে দিন করে নে বরণ আর নয় অনুক্ষণ,
শেষের ভালো করে দিল যে তোর সেই অতি আপন।

২৯.১০.১৯৮২

পদ্মা

আসবো কি আবার ফিরে–
এই বালুচর, এই পদ্মার তীরে,
নিঃসঙ্গ, নিঃসীম হেমন্তের শান্ত জলাধার–
রক্ত লাল প্রায় অস্তগামী দিবাকর
এঁকেছে তুলি নিয়ে বসে জলের ’পরে
একখানি মানসচিত্র নিপুণ করে।
পদ্মা–
তোমার বুকের মৃদু কম্পনে ঢেউ খেলে যায়
তার বিদায়রশ্মি, রক্তিম আভায়
বন্দিত সে নীলাভ আঁখি বারে বারে
ফিরে চায়, তবু ফিরাতে না পারে।
শুধু এই আশে দিয়ে গেল দান তার
হৃদয়ের টানে পূর্ব দিগন্তে আসবে সে আবার,
কিন্তু তোমার বুক চিরে ঐ যে তরীটি চলেছে বেয়ে ওপারে,
সে আর কোনোদিন আসতে নাও পারে ফিরে।
চোখ তুলে দেখ– ঐ যে বিরাট আকাশ তোমার পানে
চেয়ে আছে অনন্তকাল ধরে জানি না কি মগনে,
পুঞ্জিত ব্যথা তার জমেছে বুকে মেঘের আকারে
পারবে কি কোনোদিন ফিরিয়ে দিতে তারে?
তোমাদের মাঝে এত শূন্যতা এত ফাঁকা-ফাঁকি
নির্বাক, নিস্তব্ধ ভাষায় শুধুই বলছে ডাকি
বারে বারে– ‘মোর প্রিয়ে,
তুমি আছো তাই আমি আছি চেয়ে’।
কী গভীর ভালোবাসা তোমাদের মাঝে
রেখেছে আচ্ছন্ন করে, দূর থেকে কাছে ডাকা না সাজে
বারেকের তরে। তবুও প্রকৃতির লীলায়–
ঐ যে দূরে– অনেক দূরে তোমার আঙিনায়
দিয়েছে ধরা, তুমি মহিয়ান তাই।
বড় মধুর সে মিলন চোখের পাতায়-পাতায়

এঁকেছে স্বপ্নের সকরুণ দৃষ্টি, অব্যক্ত কথা।
আবার কখনো যদি যায় সেথা
দেখবো তোমরা অনেক দূরে– শুধু মায়াবী
শূন্যতা করেছে পূরণ একখানি সবুজ পৃথিবী
এসে তোমাদের মাঝে।
আমি কেন পারি না যে
অমন ভালোবাসতে যুগ যুগ ধরে,
নীরবে দাঁড়িয়ে একাকী সুদূর পারে।

১৪.১১.১৯৮২

জীবন-মঞ্চ

রাত নিঝুম–
আসে না ঘুম আঁখিকোণে,
বারে বারে মনে পড়ে
দাদুর মুখচ্ছবি,
ওর সাথে আমার বড় ভাব ছিল
সেই ছোটবেলা হতে।
দেখা হয় নি অনেক দিন হলো–
সেই যে রেখে এলাম সবাই মিলে
তালবাগানের এক কোণে!
কখন ছেড়েছি বিছানা
মনে নেই তা,
দাঁড়িয়ে দাদুর শিয়রে
ডাক দিই ধীরে ধীরে।
একাদশীর চাঁদ সুলগ্ন ভারি
দাদু এলেন উঠে,
বললাম, "কথা বলো দাদু,
বলো, কথা বলো,
অনেক দিন শুনি নি তোমার
সেই চেনা সুর।"
দাদুর মুখখানা ভার,
কেন যেন সে আমার চিন্তার অতীত,
তবু অতি সংগোপনে বললেন,–
তবে শোন,
আমার ইতিহাস
জীবন ইতিহাস।
কবে না জানি ঊষার সূর্য
চোখ ভরে দিয়েছিল আলো

পড়ে না মনে,
তারপর থেকে শিখলাম ভালোবাসতে
রঙিন সুন্দর পৃথিবীটাকে।
গ্রামের হিন্দুদের মণ্ডপে
যাত্রা হতো পূজাপার্বণে
দিনে দিনে শিখলাম অভিনয়,
বালক চরিত্র বটে।
অভিনয় হতো বেশ বেশ
যেমন সেজেছি
দেখেছেও লোকে ভালো,
বছরে বছর কাটলো–
তিলে তিলে হলো তাল,
সবাই ধরলো এসে-
ছেড়ে দাও বালক অভিনয়
ও তোমার সাজে না মোটেই,
আসছে শরতের পূজায়
বই হবে 'জীবন যেমন সাজ'
তুমি হবে নায়ক অধিরাজ।
আমি তো হেসেই কুটিকুটি,
ফুটলো যেন শাপলা-শালুক
জীবন নদের স্রোতে।
অভিনয় হলো ঢের
তালে তাল দিলো তরুণ-তরুণী
সময়ের অকূল প্লাবনে
স্তম্ভিত হলো সমাজ,
সময়ের তুমুল গতি
থেমে নেই ক্ষণিকের তরে
সেই সাথে আমিও,
ভেসে গেলো শাপলা স্রোতে
চুলে এল পাক।
বললো সবাই, 'কেন বাবা এহেন বয়সে

নায়কের অভিনয়!'
পিছে লজ্জা ভারি
তাই তো ছেড়ে দিলাম তা,
শেষে অনেক বুঝে
ধরলাম বাবার অভিনয়।
এতদিনে তোমার বাবা
সেও নায়ক বেজায়
মঞ্চে এলো ঢুকে,
ওদের প্রবল দাপটে
আমরা কোটরের পেঁচা যেন
তবুও ধরে থাকি হাল।
এমনি চলতে-চলতে একদিন
চলা হলো ভার
কোমর এলো নুয়ে,
নিলাম হাতে লাঠি
তখন আমার দাদাতে মানায় ভালো।
আর বেশি দিন নয়
মাত্র কয়েক বছর,
তারপর ঠেলে দিলো সবে
চিরতরে,
আমার জগৎ ওখানেই সমাপ্তি,
অভিনয় হলো শেষ,
মঞ্চে তখন নূতন অচেনা মুখ।

২৩.০৯.১৯৮৩

করণীয় কিছু

তোমার মাঝে যা কিছু আছে
দান করে যাও পৃথিবীর কাছে
চেও না কোনো প্রতিদান,
তাহলে বিফল হবে
সব কিছু অব্যক্ত রবে
বাজবে আবার বিদায়ের গান।
নিজেকে দৃঢ় রেখে
সাজিয়ে যাও এ ধরাটাকে
তবেই তো জনম তোমার পূর্ণ,
অযথা খ্যাতির আশে
দুদিনের এ পরবাসে
করো না সৃষ্টি তোমার জীর্ণ।
তুমি করো পশ্চাতের তরে
আসবে যারা তোমার পরে
তারা ভাবুক তাদের পশ্চাৎ–
এমনই সবাই মিলে
প্রতিজনে দু-একটু দিলে
পূর্ণ হবে সমগ্র জগৎ।
নিজেকে ভেবে উঁচু
দিতে যদি না পারো কিছু
জীবন তোমার হলো অনর্থ,
দিনে দিনে বৃদ্ধ হলে
মৃত্যুর কোলে পড়লে ঢলে
সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যই হলো ব্যর্থ।

২২.০৭.১৯৮২

বন্ধু আমার সোনার হরিণ ভাই

বন্ধু আমার সোনার হরিণ ভাই,
পিছু পিছু যতই ছুটে যাই,
আশা দিয়ে তত যে পালায়,
বন্ধু আমার সোনার হরিণ ভাই।
চলার পথে ক্লান্ত হলে,
আশা যখন যায় বিফলে,
আপন ঠাঁয়ে ফিরে আসতে চাই,
বন্ধু তখন ক্ষণিক ভেবে
মুচকি হাসির কথা ক'বে,
ডাকবে আবার হাতের ইশারায়,
বন্ধু আমার সোনার হরিণ ভাই।
আবার যখন ছুটতে থাকি
ভাবি এবার ধরবো ঠিকই
দেখবো সে যে কেমনে পালায়,
বন্ধু তখন পিছু চেয়ে
সামনে আবার চলে ধেয়ে
আমার আশা সবই বিফল হয়,
বন্ধু আমার সোনার হরিণ ভাই।
এমনি করে চলছে খেলা
বাড়ায় শুধু হৃদয়জ্বালা
চলছে খেলা যতই যে দিন যায়,
কবে যে খেলা সাঙ্গ হবে
আসল হরিণ চিনবো ভবে,
ঘুরছি সদা সেই দিনের আশায়,
বন্ধু আমার সোনার হরিণ ভাই।

১৭.১০.১৯৮২

আমার কেবলই বাঁশি

কী বাঁশি দিলে মম হাতে
বাজিয়ে দিবা-নিশি সাধ না মেটে কোনোমতে।
তব সুর আমার হৃদয় আঙিনায়,
ঢেউ খেলে যায় আলোর ছটায়,
তবু মেটে না জীবনক্ষুধা–
কোথা গেলে পাব সে সুধা,
আসুক বাঁশির সুরে-সুরে ধেয়ে
আমি শুধু যাব গেয়ে,
জনে-জনে, জীবনে-জীবনে।
তোমার প্রেমের আকুল গভীর ধ্যানে
ভরে দেব সুরে চারিধার
শক্তি দাও আমায় শুধু গাইবার।
তোমার মল্লিকা বনে যে আলো হাসি,
তারে যেন আমি প্রাণ ভরে ভালোবাসি।
উন্মনা আজি তোমার অভিসারে,
রূপে রূপ-ভোলা তোমা বিহারে।
তোমার ভাষায় আমার বাঁশি চঞ্চলা ওগো সাথি
বিবাগী যেন হয় না অধীর আরতি,
ফুটবে যে ফুল মোদের প্রেমোদ্যানে,
মালা গেঁথে দেব বাঁশির মরণ গানে।
সেই মিলনে মিলবো সেথা আজি তারি পিয়াসী,
দাও ভরে তব বিচিত্র সুর আমার কেবলই বাঁশি।

১৩.০৫.১৯৮৩

মনে ছবি একজনই আঁকে

জীবনে বন্ধু বেশে আসে অনেকে
মনে ছবি একজনই আঁকে,
সূর্যকিরণ বৃষ্টিতে ভিজে সাতরঙে 'রংধনু' নাম
সময় ফুরালে সকলি মিশে এক রঙে পরিণাম।
মনের কোণে এঁকেছে আলপনা যে
শত নামের ভীড়েও সেই সুরই বাজে,
মরণচিতায় যে আগুন জ্বলে
জীবনের চাওয়াখানি পুড়ে সে অনলে
ধুয়ে যাবে নদীর স্রোতে,
ব্যথার আকাশে প্রথম চাউনিতে
অবিমিশ্র সে স্মৃতিই থাকে,
মনে ছবি একজনই আঁকে।
যে পথ গিয়েছে স্বপ্নীল দিগন্তে মিশে
তাকিয়ে আজীবন তারি পানে অনিমিষে,
যত খেলা অন্য জনপথে
রয়ে যাক বিনিদ্র গভীর রজনীতে,
নির্মল রেখাটানা সে-যে প্রথম স্মৃতির বাঁকে-বাঁকে
মনে ছবি একজনই আঁকে।

২২.০৯.১৯৮৩

হারালি কি তুই জীবন প্রাতে

কী এমন হারিয়ে কেঁদেছিলি তুই জীবনপ্রাতে,
সেই কান্না তোর চিরসাথি হলো–
একটু আঘাতে চোখ জলে ভাসে,
হারানো মানিক খুঁজে গেলি চরাচরে, পথে পথে–
সেই হতে তোর খোঁজা হলো শুরু।
প্রকৃতির চির মায়াময় নিবিড় কানন
নিরবধি তন্ন তন্ন করে খুঁজলি,
পেলি নে আর ফিরে কোনোদিন।
আশার সিঁড়ি বেয়ে তবু খোঁজা–
হারালি কি তুই ব্যক্ত হলো না আজও।

০৯.১১.১৯৮৩

নিছক কিছু নয়

নিছক দৃষ্টি দেয়া নয়–
অনুভূতির বেড়-জাল ফেলে দেখতে এসেছি সুন্দর পৃথিবীকে,
দেখে দেখে মনের মাধুরী মিশিয়ে তাই
ভাষার আখরে লিখতে এসেছি আমি তাকে।
লিখে যদি সাধ অপূর্ণ রয় কখনো
মনের আকাশে সাজিয়ে সুরের ডালি আমার বীণায়–
গাইতে এসেছি আমি সেই ক্ষণ।
যদি লেখার ভাষা থেমে যায়, গানের মালা ছিঁড়ে যায়–
তবে আসা-যাওয়ার রেলিংখানি অতি সংগোপনে বেয়ে-বেয়ে
নীরব ভাষায় নয়ন বুলিয়ে সেথা
তুলির পরশে রঙে-রঙে রঙ ছড়িয়ে,
আঁকতে এসেছি আমি তা।

০৮.১১.১৯৮৩

তোমায় দেখেছি বহু বেশে

তোমায় দেখেছি সবুজ ধানে
আপন মনের দোর ছোঁয়া সুপ্ত ঘ্রাণে,
হাসনাহেনার একগুচ্ছ রঙিন পেলবতায়
হেমন্ত শেষের নিশীথে ঝরা এক বিন্দু শিশিরকণায়,
ষোড়শী নারীর টুকটুকে ঠোঁটে, কাঁকনের ঝংকারে
বিমনা হৃদয়ের একতারা-সুরে তুমি এসেছো বারেবারে।
শীতের বিকেলে আকাশের এক দিগন্তজুড়ে
অতি মন্থর বেগে মিলন রাগে উড়ে উড়ে,
শেষে থরে থরে একান্ত পাশাপাশি
তুলির রং ধরে বিচিত্র বেশে আসি’
সাজিয়েছে নিজেরে যে ছিন্ন মেঘদল, রবি,
সেখানেও তোমার স্বকীয় ছবি,
চোখের কিনারে সে রংটুকু নিয়েছি–
তোমায় তবুও সেখানে দেখেছি।
গ্রীষ্মের বিদগ্ধ দুপুরে আমবনে ঘুঘুর ডাকে
ধীর মনে একান্ত নির্বিবাকে–
সে ডাক শুনেছি,
সংগীতে ভরে সুররাশি, তবুও তোমায় দেখেছি।
হিঁদুদের মায়ানাশি জীবন-স্বর্গীয় চিতায়
সাথিহারা জীবনের যে স্রোত নিত্য বয়ে যায়
তার কলতানে নিজেকে বহুবার হারিয়েছি–
তার মাঝেও তোমায় দেখেছি।
প্রতিদিন পাঁচবার সুউচ্চ গগন-ছোঁয়া মিনারে
যে ধ্বনি সজীব করে একত্ব চারিধারে–
সে ভাষায় হৃদয় বেঁধে নীরব থেকেছি,
তোমাকে সেখানেও দেখেছি।

০৬.১১.১৯৮৩

একই চাওয়া ভিন্ন সময়ে

আমার কৈশোর জীবন, আমার আকাঙ্ক্ষা, সাধ–
কোমল হৃদয় অল্পে তুষ্ট, ব্যর্থতায় আঘাত,
ক্ষণিক না পাওয়ার গ্লানি। তবু আশা
ফাগুনের দখিনা বাতাসে চারা চারা সবুজ ধানের বনে ক্লান্তিতে বসা,
আবার দৌড়াদৌড়ি একটি ঘুড়িকে কাঠির মাথায় বেঁধে,
অনেক উঁচুতে পত্ পত্ পত্, আমি অতি আনন্দে–
সবার উপরে আমার ঘুড়িটি উড়ুক সুউচ্চ আকাশে,
এই তো চাই– জীবনের চাওয়া। সেই সাথে ত্রাসে
কাঁপে বুক দুরু দুরু না জানি সুতা কাটে কখন।
অখিলের ব্যাপ্ত চির মায়াময় বন,
দিনে দিনে আকাঙ্ক্ষায় ব্যাপকতা–
একই গান, একই সুর, কেবল বয়সের ভিন্নতা
আজও রেখেছে আকীর্ণ করে জীবনের পথে পথে।
ঘুড়ির স্থানে নূতন সৃষ্টি পদাঙ্ক ধ্বনিতে–
উড়ুক নিসর্গ আকাশে জীবনবায়ু বেগে ধীরে ধীরে
আমার সৃষ্টি, সবার উপরে এই তো চাওয়া। ফিরে ফিরে
দেখা না জানি কখন জীবন সুতা কেটে,
লুটাই সম্বল তনুখানি মোর মহাশ্মশান তটে।

০৬.১১.১৯৮৩

নারী

১

কাল এতক্ষণ কুরুক্ষেত্রে নেমেছিল এ-বাড়ি ও-বাড়ি,
একান্ত শত্রু নাকি চারপাশ ঘিরে
আবার যদি কথা বলে কখনো,
যদি মুখ দেখে কেউ কারো,
"মরা স্বামীর মাথা খায়"– এমন প্রতিজ্ঞা।
কত কি নিছক পুরনো কথা
অত কে রাখে মনে,
আমি বলি, 'আহ্! থামাও না একবার,
একি অনাসৃষ্টি!'
রাতটুকু নিরবদ্য কেটেছে,
শীতের বেলা পলকে অনেক দূর–
ছই-ঘেরা গাড়ি এসে থামলো দুয়োরের পাশে
ফিরে যেতে হবে স্বামীগৃহে এ বাড়ি পিছু ফেলে।
চলে খানা-পিনা এ-বাড়ি ও-বাড়ি–
হাসাহাসি সবাই মিলে,
গতকাল আজ গত।
তারপর বিদায়ের ক্ষণ,
কান্নার রোল, বাহুবন্ধনে একে অন্যকে ধরে
চোখের পানিতে আঁচল সিক্তপ্রায়
চারপাশ ঘিরে চোখ মোছামুছি–
কারো কারো ডুকরে কাঁদা,
ভ্যাবাচ্যাকা গাড়োয়ান বেচারা।
আমি বলি, 'আহ্! থামাও না একবার,
একি অনাসৃষ্টি!'

০৯.১১.১৯৮৩

২
নারী রহস্যময়ী,
বিধাতার অপার লীলা–
নারীকে ভেবো না, করো না বিশ্লেষণ
অহেতুক অশান্তি ডেকো না।
ফুলের অঙ্গ শুধু কীটে ভরা
পাবে না একটিও কীটশূন্য ফুল
সমগ্র বাগান ঘুরে।
তারচে’–
ভাবের সৌরভে ভরে তোলো মন
অতীত ঠেলে দাও পিছে,
বর্তমানে যা পেলে তাই নিয়ে চলো–
সে তো তোমাতেই দিয়েছে প্রাণ
এই বর্তমান,
খুশি করো তাকে হবে সুখী
গুণী হলে পাবে সুখ
ব্যর্থতায় বাড়াবে জ্বালা।

সমর্পণ

প্রিয়, তোমার বাঁশিতে এত সুর
আমার বীণার তারে বাজে বিরহ বিধুর,
ব্যথার উপকূলে গড়া মালাখসা কয়েকটি ফুল
দিয়েছো ফেলে আমার দ্বারে, প্রেমে অতুল–
আমার হৃদয় কন্দরে তোমার উপস্থিতি সদা জাগে
সৃষ্টির ধ্বনিতে, জানালা দিয়ে ঢোকা রবি-রশ্মির রাগে।
তোমায় কি পাব আমি আমার ব্যর্থ বীণায়,
যাবে কি ঢেলে দেয়া আমার আরতি তোমার আঙিনায়?
শত শত তোমার সৃষ্টিদলে বিমূর্ত তুমি চিরজীবী
ভাবের ললিত ক্রোড়ে আমার মাঝে তোমার ছবি
বিলোল চোখে তারি ধরা চারিধার,
যদি আশা থাকে ফেরাও ও নয়ন একবার,
বেঁধে নিই তোমার প্রেম-সুর আমার আরব্ধ তারে
ডেকে যাক বান তোমার-আমার হৃদয় সংগীত আধারে।

০৬.১১.১৯৮৩

অনেক কথা ছিল বলার

অনেক কথা ছিল বলার
কেন জানি বলা হলো না–
আশার প্রস্ফুটিত ফুলগুলো শুকিয়ে শেষে ঝরে গেল,
বলা হলো না।
প্রত্যগ্র অনুভূতি দিনের শেষে উড়ে পালায়–
যেমনি পালায় রাতের স্বপন
দিনের বাস্তব-মুখর আলোর ঘনঘটায়,
যাত্রাপথে ট্রেনের কামরায় বসে ক্ষণিক সঙ্গী যেমন
স্টেশনে নেমে যার যার পথে পথ ধরা–
প্রতিদিন ঘটনার সাজে তেমনি ক্ষণিক দেখা,
অনুভূতির বেড়াজালে বেঁধে নেয়া
অসম্পূর্ণ বলা, যদিও বলার ছিল আরো।

১৮.১১.১৯৮৩

একাকী

পাখা মেলে উড়েছি কোন সুদূরে
ঘর ছেড়ে ঘরের সন্ধানে
রংধনুর সাত রং এঁকেছি চোখে
কী নেশার মাধুরী মিশিয়ে।
পিছু ফিরে–
মিছে পস্তানো শুধু আর
সময়ের অনিবার পিছু পিছু,
পুঁতির মালা বাঁধা ডোর খুলে
এক প্রান্ত ধরে যেন উঁচু করা,
কে কোথায় একে একে এক নিমিষে
যার যার পথে বিশৃঙ্খল চলা,
হাতে পড়ে সুতার গাঁটটি মিছে
আর একটি দানা নিজে একা।

২২.১০.১৯৮৩

করবে না ক্ষমা জানি

কেউ আমায় কোনোদিন করে নি ক্ষমা
করবে না জানি তাও।
ছোট হতে বাবা গিয়েছে পরলোকে
ফিরে দেখেনি তো একবার,
ফেলে যাওয়া বিশাল সংসার
নেমে এল আমার মাথায়।
বইতে বইতে কোমর গেল নুয়ে,
তবুও করে নি ক্ষমা– পাই নি একটুও আশ্রয়।
তারপর শিক্ষার্থী হয়ে পেলাম প্রচুর বন্ধুবর,
তারাও তথৈবচ বসলো চেপে ঘাড়ে,
যাকে তাকে মন দেয়া
এ বদভ্যেস আমার ছিল,
ক্ষমা তারা জানে না মোটেই,
কমতি হলেই কিংবা কাজের শেষে
প্রীতি উপহার হৃদয়ভাঙা আঘাত
অথবা বদনামের বোঝা
সেও তো আমারই ঘাড়ে,
তারপর দেখিয়েছে পশ্চাৎ,
প্রয়োজনে তোষামুদে হয়েছি প্রচুর
এ সৌভাগ্যটা ঢের,
ভেঙেছে কাঁঠাল মাথায়
শেষে আঠাই ভরপুর
চুলগুলো গেছে ন্যাড়া হয়ে,
তারা তো অনেক দূরে দাঁড়িয়ে
দেখেছে ন্যাড়া মাথা আর হেসেছে,
দোষগুলো সবি নাকি আমার–
মাথাটা নাকি তেমন শক্ত নয়,
আমিও তাতেই রাজি
বুঝেছিও তাই–
এই তো জীবনের জয়-পরাজয়,
কেউ আমায় কোনোদিন করে নি ক্ষমা
করবে না জানি তাও।

২৭.০৮.১৯৮৩

স্মৃতিকথা

যা কিছু স্মৃতি আছে আমার এ হৃদয় ভরে,
দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির গহ্বরে।
ক্ষণেকের তরে উঠে আসে, মনোমাঝে ব্যথা দেয়
আবার তা বাতাসের মতো সেখানেই মিশে যায়।
ছোট ছোট স্মৃতিগুলো অনেক বড়, স্তূপীকৃত হয়ে
জমাট বেঁধেছে বুকের মাঝে অমরত্ব নিয়ে।
হারিয়ে ফেলি আপনাকে– যখন ভেসে ওঠে মনে,
একদিনে ঘটে নি, যা ঘটেছিল দিনে দিনে।
হৃদয় বইয়ের সমস্ত পাতা একে একে মেলে যায়,
কতগুলোর নূতনত্ব বাড়ে, কতগুলো বা হারায়।
কতগুলো জটা পাকিয়ে, কতগুলো স্বচ্ছ পরিষ্কার,
আবার ডানাভাঙা পাখির মতো, কতগুলো বিক্ষিপ্ত মেঘের আকার।
সমগ্র হৃদয়াকাশের এক কোণ হতে অন্য কোণে,
ভেসে চলে যায় ইতস্তত হয়ে আপনার বিহনে।
কতক খুঁজে পায় পথ, কতক পারে না যেতে চিনে,
যেমনি হয়– বিহঙ্গরা ফিরে আসে যখন নীড়ে দিবাবসানে।

১০.১১.১৯৮৩

বিদায়ের পালা

আর পরিচয় নয়– এবার এলো ভুলে যাবার পালা
তবে চলি, যার যার পথে–
শেষ হলো মন দেয়া-নেয়ার খেলা,
যে ফুল ফুটেছিল প্রাতে
সে আজ ধুলোতে লুটায়,
শূন্য বৃন্ত একা আছে চেয়ে দাঁড়িয়ে
যার তরে এত পূজা, নিয়েছে সে বিদায়
গিয়েছে ফুলটাকে মাড়িয়ে।
আর মন নয়, আর প্রেম নয়
শুধু বিরহ ব্যথায় সমগ্র হৃদয়জুড়ে,
জয়ের পরে এবারে পরাজয়
স্মৃতির পাখিরা উড়েছে সিন্ধু ’পারে,
এবার বিদায়ের পালা গানের কথা শেষে,
অশ্রুজলে ভাসে শেষের সভায়।
সুরগুলো দিগন্তে যাক ভেসে
বাজুক সুর পূরবী রাগে জীবন একতারায়।

২৮.০৮.১৯৮৩

অনুশোচনা

অতীতের যত ভুল, পাপ
বুঝে এখন করি অনুতাপ,
মনে হলে দুঃখ আনে
তবুও তারে রেখেছি অতি সংগোপনে।
যেদিন ফেলেছি হারিয়ে,
পাব কি তারে দু'হাত বাড়িয়ে!
সব কিছু বৃথা ভাবনা
সেদিন আর আসবে না,
ফেলে এসেছি যারে
দুঃখ আর করবো নারে,
মিছে শুধু ভবের মাঝে
বেলা গেল ঘিরলো সাঁঝে।

তোমাকে মনে পড়ে

শত কাজে, পেঁচা ডাকা বিনিদ্র নিশীথে
সোনালী সূয্যে চোখ মেলে জানালায়– শিশির প্রাতে,
রজনীগন্ধার একগুচ্ছ রঙিন কেশরে
অতি সন্তর্পণে ভ্রমর যেথায় বসেছিল মধুর বাসরে,
রিক্ত ফুলবন তাই– আমি সাথি আঁখি নীরে
ভুলতে পারি না কোনোমতে– তোমাকেই মনে পড়ে।
শরতের মেঘে মেঘে মিলন সেতু বেঁধেছিল জানি না কভু
বারে বারে সে আশায় উড়ে ফিরি আজো তবু,
ভরা বানে ভাসিয়ে দু'কূল উন্মনা নদী বয়
হারানো দিনের পুরনো কথা স্রোতে ভেসে যায়,
মিছে আশায় প্রাসাদ গড়ি, কখনো গড়ি খেলাঘর
সমস্ত হৃদয়জুড়ে, অবিমিশ্র জীবনভর–
শত আশা, শত ব্যথা, শত পাওয়া না-পাওয়ার ভিড়ে
অম্লান, নিখাদ-বিমলিন সে স্মৃতি– শুধু তোমাকেই মনে পড়ে।

আত্মবিশ্বাস

চলেছি পথ বেয়ে–
পথের ধার ঘেঁষে একটি ডালে
একটি পাখি,
কত সুন্দর পাখিটি!
ওকে যদি একবার পারতাম ভালোবাসতে!
ওর কোনো ক্ষতি করবো না আমি,
গান গেয়ে যাক ওর ধ্যানে,
না– দরকার নেই আমার ভালোবাসা
কাছে পাওয়া– বুকে নেয়া,
ও ধন্য ওর গানে
আমি ধন্য আমার চলাতে।
আমি পাশ ঘেঁষে যাব
ও থাক না বসে ঐ ডালে
আমি ওকে একটুও কিছু বলবো না
একবার বিশ্বাস করুকই না আমাকে,
না, পাশে যেতেই উড়ে গেল পাখিটি–
আমাকে অবিশ্বাস করলো!
নিজের মনে ভাবি–
তবে কি আমি প্রতারক?
উত্তর আসে, 'না'–
তবে?
ওর কাছে আমি অবিশ্বাসী,
কিন্তু আমার আত্মবিশ্বাস?
দাম নেই তা পরের কাছে।

নেভা দীপ

আর চাওয়া-পাওয়া নয়, এবার অন্য কোনো কথা
আর ফিরে যাওয়া নয় প্রথম পথের বাঁকে,
বংশীবাদক বাঁশিকে কাঁদাতে জানে
নিজেকে ছদ্মবেশে ঢেকে, বাঁশি কাঁদে,
বাদক কাঁদিয়ে হাসে– আবার কাঁদায়।
বাতাস কখনো দখিনা কখনো উত্তুরে– নানা বেশে,
ঝড়বেগে কিংবা দোলনচাঁপায় চড়ে
দোলা দেয় ফলবনে–
গাছ জানে ফল ধরে রাখা অত সোজা নয়
ফলের ভারে গাছ অবনত ব্যথায় ন্যুব্জ প্রায়,
বাতাস দুলিয়ে হাসে।
তেলটুকু নিঃশেষ– নেভা দীপ শুধু আর
কী হবে আগুন জ্বালিয়ে তাতে,
সলতেটুকু মিছে পোড়ানো– দিনে দিনে ক্ষয়
আলোর বন্যা চাওয়া অরণ্যে রোদন।

সেই ভালো হতো

আবার শুরু হলো পথ চাওয়া– তোমার আশা
দূরে ছিলাম বেশ ভালো ছিল, ছিল দুরাশা–
গ্রীষ্মের দুপুরে সূর্যের দিকে চোখ খুলে সরাসরি দেখা
ঝল্‌সানো চোখে বিদগ্ধ কিরণরেখা,
তার চেয়ে শীতের হিমেল প্রাতে
বাতায়ন ভরে আসা সোনালী রবি রশ্মিতে
খোলা চোখে ভরে নেয়া দূরের আলো
সেই ভালো ছিল প্রিয়– সেই হতো ভালো।
শ্রাবণের ঝরঝর বরষায়–
হারানো স্মৃতি মন ছুঁয়ে আসে দমকা উত্তুরে বায়,
স্মৃতির বাতায়নে গাঁথা মালা-খসা ক’টা ফুল
ব্যথার গহনে ঠাঁই খুঁজে ফেরে উপমা অতুল,
জীবন আকাশে তুমি বিমলিন শুকতারা হয়ে
চিরজীবী মন নিয়ে মনের বিনিময়ে
দু’টি প্রাণ তৃষাতুর নাদে অহর্নিশি থাকতো,
ভালো হতো প্রিয়– সেই ভালো হতো।

অস্তিত্বের সংকট

মহানগরীর বুকে ঝুলন্তাবস্থায়
প্রতিনিয়ত জনপিষ্ট হয়ে বাসে চেপে যেতে হয়
অফিসে। সেদিনও এমনিভাবে চলেছি গন্তব্যপথে,
দ্রুতগতির ক্ষণিক চাউনিতে
চোখে ভেসে এলো গোটাদুই কুকুরের
গলায় রশি বেঁধে টানছে চাকর
বাসার গেটে, পরিচ্ছন্ন লোমশ শরীরে রঙের প্রলেপ পড়েছে,
সামনে সুখাদ্যের ডালি অরুচি, সাহেবি ধাঁচে
জীবনকে উপভোগ তিলে তিলে প্রতিক্ষণে,
বিকৃত রুচির অত্যাধুনিক মানে।
গেটে স্পষ্টাক্ষরে লেখা 'কুকুর হতে সাবধান'।
নিষ্করুণ পৃথিবীর জন-ভিড়ে মিশে আছে আজীবন
যে অগণিত দোপেয়ে নিরন্ন নিরীহ 'প্রাণীগুলো', অভুক রজনী শেষে
একমুঠো প্রাতরাশের জন্য কারো দুয়োরে নির্নিমিষে
দাঁড়িয়ে কিংবা ডাস্টবিনের দুর্গন্ধ উচ্ছিষ্ট অথবা হোটেলের
পেছনে ড্রেন থেকে কুড়িয়ে জীবন প্রদীপে কেরোসিনের
তেল জোটায়, যাদের বুকের স্পন্দন নেশায়
মেতে এ দেশ দাঁড়াবে একদিন বিশ্বসভায়,
যারা অন্ন পেলে দেবে ভাষা, দেবে
সুমধুর কথা প্রতিদানে, নির্দ্বিধায় জীবন দেবে ঢেলে সরবে
একে একে, এমন গলায় যদি ওঠে সদ্য সাহেবি রশি
যদি পায় একটু স্নেহাস্পদ, ঠিক এমনি একটু হাসি
ভরা মুখ, অন্নে-ভরা একথালা সুস্বাদু খাবার
দু'চোখ ভরা আনন্দাশ্রু, আর নিভৃতে একটু জায়গা ঘুমোবার।

বেকারত্ব

শূন্যে ঘর বাঁধার স্বপ্ন আর আমার নেই
শুধু দু'মুঠো ভাত দু'বেলা পেটের খিদেই,
সার্টিফিকেট হাতে নিতে আর আমার গর্বে ভরে ওঠে না বুক
স্বপ্নীল কামনার ফসল আজ অতি তুচ্ছ। বিমুখ
করেছে– আনন্দে কাঁচি হাতে আমি চাষি,
তাঁতের কাপড়ে মোড়া বউ, উঠোনে ধান রাশি রাশি,
হয়তো বা সেই ভালো হতো
সারা দিনের পরিশ্রমে ভাতের নিশ্চয়তাটুকু থাকতো।
কিন্তু না– আমি এখন প্রশস্ত রাজপথে
শিক্ষাঙ্গনের একমাত্র সঞ্চয় সার্টিফিকেট হাতে
গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে কিংবা হিমেল ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজে
অফিসে অফিসে বড়বাবুর আসা-যাওয়ার খোঁজে,
দাড়িগোঁফে মুখখানা উড়ে-যাওয়া পাখির পরিত্যক্ত বাসা
পোশাক পরিচয়ের ঐতিহ্যবাহী পতাকা, উষ্কখুষ্ক চুল উপদ্রব-দশা,
বাপের সংসারে আমি বেমানান মস্ত বড় বোঝা
অতীতে ছিলাম একদিন যা
স্বপ্নময় একান্ত ননীর গোপাল, ছোট্ট কুঁড়েঘরে
কৃষক বাবার ভবিষ্যতের গৌরব অন্তরে বাইরে,
আজ তা মিশেছে দূরের আকাশে
গ্লানিভরা একফালি দুরাশার চাঁদ অন্ধকারে ঢাকা সে,
বেনামি একটা পত্র যেন আমি যত্নের অপেক্ষায়
পথে পথে আবর্জনা। বুকের উষ্ণ যৌবন কেঁদে পালায়
বাসা-হারা পাখিদের সাথে, দাম্পত্য ঘর বাঁধা
তার-ছেঁড়া বেহালায় ব্যর্থ সুর সাধা,
জীবন প্রদীপ হতাশার ঝড়াবর্তে অতি ক্ষীণ জ্বলে
আমি নাকি শিক্ষিত বেকারদের একজন, লোকে এরকম বলে।

ওগো সাথি পথ বহুদূর

ওগো সাথি এখনো পথ বহুদূর যেতে হবে,
ঐ ধু-ধু মাঠ, প্রখর সূর্য পেরিয়ে
তারপর বনাঞ্চল, সবুজের ছায়া।
ষোলটি বছর হলো প্রথম পরিচয়,
সে অবধি ভাব বিনিময় শুরু।
তোমার গা ছুঁয়ে আমার গোপন মনে
জেগে উঠেছিল যে ভাষা, আজ তা অতীত গবাক্ষে,
তোমার বুকে শোণিত ধারা ঢেলে দিল
কত উচ্ছল প্রাণ একই অঙ্গীকারে।
কই? তারা তো ফিরে আসে নি আর কখনো!
কৈশোর পেরিয়ে তুমি এখন যৌবনা,
তকতকে উন্নত উষ্ণ বুক, ডাগর চোখের ইশারা
যা আমি নিতান্ত প্রত্যাশী, অথচ–
তোমার দেহপল্লবীতে তেমন কোনো রেখার স্পষ্টতা নেই,
সেই সাথে নিশুতি রাতে পেঁচাদের অমঙ্গল ডাক
আমাকে শংকিত করে তোলে প্রতিরাতে–
ঐ বুঝি যমদূত এল শিয়রে!
তোমার নিতম্ব বরাবর কেশগুচ্ছ, কেমন যেন
বিবর্ণ খুশকিতে ভরা, এলোমেলো উদাসী দৃষ্টি,
পাণ্ডুবর্ণ অবয়ব, বেরসিক প্রেমিক কর্তৃক ছুড়ে মারা
এসিডদগ্ধ মুখশ্রী যেন,
আমিও ব্যথায় নিয়ত কাতরাচ্ছি–
আজকাল বড্ড আত্মভোলা হয়েছি মনে হয়,
একটু চোখ মুদে আনমনা হলেই যেন দেখি–
তোমাকে ভাগবাটোয়ারা নিয়ে ভণ্ড প্রেমিকদের দলবদল,
বুভুক্ষু অসংখ্য শকুনের দল সাদা কাপড়ের আড়ালে
তোমাকে অনবরত ঠুকরে খাচ্ছে,
ভনভনে বুনো মাছির ঝাঁক উড়ছে– বসছে,

কিছু পেতে চাচ্ছে কিংবা পাচ্ছে,
কতক বেওয়ারিশ কুকুর তোমার শুকনো
মাংসহীন হাড় নিরবচ্ছিন্ন চাটছে ক্ষুধায়, এবং
কায়ক্লেশ নির্জীব মজুর-চাষি ভাগে বিমুখ দূরে দাঁড়িয়ে
হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস সম্বল,
এ কোন অমঙ্গল ছবি ভেসে আসে চোখে,
ওগো সাথি এখনো পথ বহুদূর−
ঐ যে ধু-ধু রেখা পেরিয়ে তারপর বনাঞ্চল, সবুজের ছায়া।

৩০.০৬.১৯৮৭

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ

জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার শম্ভুনগর গ্রামে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞানে বি.কম. (অনার্স) ও এম.কম.। বি.আই.এম. থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আই.সি.এম.এ.বি. থেকে সি.এম.এ. এবং বর্তমানে একজন এফ.সি.এম.এ.। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচ.ডি.। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভার্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট।

তেত্রিশ বছর ধরে তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

তোমাকে মনে পড়ে

শত কাজে, পেঁচা ডাকা বিনিদ্র নিশীথে
সোনালী সূর্যে চোখ মেলে জানালায়— শিশির প্রান্তে,
রজনীগন্ধার গুচ্ছে রঙিন কেশরে
অতি সন্তর্পণে ভ্রমর যেখানে বসেছিল মধুর বাসরে,
রিক্ত ফুলবন তাই— আমি সাথী আঁখি নীরে
ভুলতে পারি না কোনোমতে— তোমাকেই মনে পড়ে।
শরতের মেঘে মেঘে মিলন সেতু বেঁধেছিল জানি না কবে
বারে বারে যে আশায় উড়ে ফিরি আজো তবু,
ওরা বানে ভাসিয়ে দু'কূল উচ্ছল নদী বয়
হারানো দিনের পুরনো কথা স্রোতে ভেসে যায়,
মিছে আশায় প্রাসাদ গড়ি, কখনো গড়ি খেলাঘর
সমস্ত হৃদয় জুড়ে, অবিমিশ্র জীবন ভর—
শত আশা, শত ব্যথা, শত পাওয়া না-পাওয়ার ভীড়ে
অম্লান, নিখাদ-বিমলিন সে স্মৃতি— শুধু তোমাকেই মনে পড়ে।

হাসনান আহমেদ